উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন ও ইংরেজ শাসনের সূচনা

ইউনিট ৫

ভূমিকা

যুগযুগ ধরে উপমহাদেশের সাথে স্থল ও জলপথে ইউরোপীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগাযোগ ছিল। কারণ উপমহাদেশের ধন-সম্পদের আকর্ষণ বিদেশিদের এ অঞ্চলে আসতে আগ্রহী করে তোলে। ফলে বিদেশি বণিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কিন্তু তখন জলপথের বাণিজ্য শুধু আরব বণিকদের হাতেই ছিল। পনের শতকের শেষের দিকে পাশ্চাত্য থেকে উপমহাদেশে পৌঁছবার নতুন জলপথ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে উপমহাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দরসমূহ হতে বিভিন্ন দ্রব্যাদি সরাসরি ইউরোপীয় বন্দরে পৌঁছাতো। এভাবে উপমহাদেশের সাথে ইউরোপের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং উপমহাদেশের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে; যা পরবর্তীকালে উপমহাদেশের ইতিহাসের ধারাকে পরিবর্তন করে আধুনিক যুগের সূচনা করেছিল। এ ইউনিটের সংশ্লিষ্ট পাঠে ইউরোপীয়দের আগমন, পলাশীর যুদ্ধ, বক্সারের যুদ্ধ, দিউয়ানি লাভ ও দ্বৈতশাসন প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-৫.১ ইউরোপীয়দের আগমন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- উপমহাদেশের সাথে ইউরোপের বাণিজ্যিক যোগাযোগ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ইউরোপীয় বণিকদের আগমন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- উপমহাদেশে ইউরোপীয় বণিকদের আগমনের ফলে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	পর্তুগিজ, বার্থলমিউ দিয়াজ, আলভারেঞ্জ ক্যাব্রাল, ভাস্কো-দ্য-গামা, কালিকট, চৌল, বোম্বাই, সালসেটি, বেসিন, কোচিন, গোয়া, দমন, দিউ, হুগলি, বাণিজ্য কুঠি।

পর্তুগিজ

বাণিজ্যকে মূলধন করে পর্তুগাল থেকে পর্তুগিজরা এ উপমহাদেশে আসলেও ক্রমে তাঁরা সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখে। পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দ্য-গামার উপমহাদেশে আসার পরপরই পর্তুগিজরা এ দেশে আসতে শুরু করে। এরপর ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে বার্থলমিউ দিয়াজ, আলভারেঞ্জ ক্যাব্রাল ও ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে আলবুকার্ক গোয়াতে আগমন করেন। আলবুকার্ক উপমহাদেশে পর্তুগিজ-শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কলম্বাস এবং ম্যাজিলানও বিখ্যাত পর্তুগিজ নাবিক ছিলেন। উপমহাদেশে আসার অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা এদেশের পশ্চিম উপকূলের কালিকট, চৌল, বোম্বাই, সালসেটি, বেসিন, কোচিন, গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি বন্দরে, সিংহলের নানাস্থানে এবং বাংলার হুগলী বন্দরে তাঁদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। তাঁদের নৌ ও সেনাবাহিনী খুব শক্তিশালী ছিল।

পর্তুগিজরা বাংলাদেশের চট্টগ্রামেও বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে এবং কুঠিগুলোকে দুর্গে পরিণত করে। পর্তুগিজরাই প্রথম ইউরোপীয় যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজে এদেশে সুদূরপ্রসারী ও স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে। সুস্বাদু ফল আনারস, পেপে, পেয়ারা, জলপাই, কামরাঙ্গা প্রভৃতি তাঁরাই এদেশে প্রচলন করে। পর্তুগিজরা চীন, ব্রুনাই, মালাক্কা, হরমুজ, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশ থেকে মূল্যবান কাপড়, বাদাম, মসলা, রং, কড়ি, কর্পূর এনে উপমহাদেশে বিক্রি করতো আর বাংলাদেশ থেকে সূতি ও রেশমী কাপড়, পাট, তামাক, চামড়া, চাল, ডাল, ঘি, তেল, মধু মোম অন্যান্য দেশে নিয়ে যেত।

ভাস্কো-দ্য-গামা

আলবুর্কাক

পর্তুগিজরা কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যই করত না, তারা এদেশের জমিদার ও প্রতাপশালী বার ভূঁইয়াদের সেনাবাহিনীতে চাকরী করত। আবার সুযোগ পেলেই জুলুম, অত্যাচার ও লুণ্ঠন করতো। অনেক সময় সম্রাট বা নবাবের আইন অমান্য করে বিনা শুল্কে স্বাধীনভাবে ব্যবসা চালাত। এতে তাঁরা মোগল সম্রাটের বিরাগভাজন হন।

পর্তুগিজরা আরও নানা প্রকার অপরাধমূলক কাজ করত। তাঁরা জোর করে এদেশেরই অসহায় বালক-বালিকাদের খ্রিস্টান বানাত। এদেশের মানুষকে ধরে নিয়ে দাসদাসীরূপে বিক্রি করতো বিদেশের বাজারে। পর্তুগিজ সৈন্যরা জোর করে এদেশের মেয়ে বিয়ে করত। তাদের এ অপরাধের মাত্রা বেড়ে গেলে সম্রাট শাহজাহান পর্তুগিজদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করেন। সম্রাটের নির্দেশে কাসিম খান তাদের হুগলী কুঠি থেকে বিতাড়িত করেন। সর্বশেষ বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খান তাদের চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ ঘাঁটি দখল করে চিরতরে এ দেশ থেকে উচ্ছেদ করেন।

ওলন্দাজ বা ডাচ

হল্যান্ডের অধিবাসীদের ওলন্দাজ বা ডাচ বলা হয়। ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজরা জলপথে উপমহাদেশে আসে। প্রাচ্য বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে হল্যান্ডের একদল বণিক 'ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে। তারা কালিকট, নাগাপট্টম, বাংলার চুঁচুঁড়া ও বাঁকুড়ায় বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। এছাড়া বালেশ্বর, কাশিমবাজার এবং বরানগরেও তাদের কুঠি ছিল। প্রথমে ওলন্দাজগণ ইংরেজদের সাথে রেশমী সূতা, সুতি কাপড় চাল, ডাল সোরা ও তামাক এদেশ থেকে রপ্তানি করত এবং অন্যদেশ থেকে এদেশে মসলা আমদানি করত। ইংরেজদের সাথে তাদের যে বাণিজ্য চুক্তি হয় তা দু'বছরের মধ্যে ভেঙ্গে গিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। অন্যদিকে বাংলার শাসনকর্তাদের সাথেও তাদের প্রবল বিরোধ দেখা দেয়। এ বিরোধ বেশি বেড়ে গেলে ইংরেজগণ ওলন্দাজ কুঠিগুলো দখল করে ফেলে। আর এভাবে ওলন্দাজদের বাণিজ্যিক সুবিধা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তাঁরা উপমহাদেশ ছেড়ে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় চলে যায়। সেখানে তাঁরা উপনিবেশ স্থাপন করে। ফলে এদেশে ইংরেজদের শক্তি বেড়ে যায়। বর্তমান ইন্দোনেশিয়া ওলন্দাজদের কাছ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে।

দিনেমার

ডেনমার্কের অধিবাসীদের দিনেমার বলা হয়। ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে দিনেমারগণ উপমহাদেশে বাণিজ্য করার জন্য 'দিনেমার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে এবং দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কুরে ও কলকাতার শ্রীরামপুরে তাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। অবশেষে দিনেমারগণ কোনো প্রকার বাণিজ্যিক সফলতা ছাড়াই এদেশ থেকে চিরতরে বিদায় নেয়।

ইংরেজদের আগমন ও ক্ষমতা বিস্তার

পর্তুগিজ ও ওলন্দাজ বণিকদের বাণিজ্যিক সাফল্য ও এদেশের বিপুল ধন-সম্পদের বর্ণনা ইংরেজ বণিকদের মনে এদেশে বাণিজ্য করার আগ্রহ সৃষ্টি করে। উপমহাদেশে তখন মোগল-সম্রাট আকবরের রাজত্বের শেষ সময়। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংল্যান্ডের রানী এলিজাবেথের কাছ থেকে ১৫ বছর মেয়াদী সনদ নিয়ে এদেশে বাণিজ্য করতে আসে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে তারা ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে মুম্বাইয়ের নিকট সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ রাজদূত স্যার টমাস রো সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে এসে ইংরেজদের বাণিজ্যের জন্য কিছু সুবিধা আদায় করেন। এরপর মস্‌লিপট্টমে ইংরেজদের দ্বিতীয় বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। পর্তুগিজরা বাংলা থেকে বিতাড়িত হলে ইংরেজগণ বালেশ্বরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে এবং করমণ্ডল উপকূলে কিছু জমি নিয়ে একটি দুর্গ নির্মাণ করে এবং এ দুর্গই পরে মাদ্রাজ শহরে পরিণত হয়। ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে জলপথে ইংরেজগণ হুগলিতে আসে এবং বাংলার সুবেদার শাহ সুজার অনুমতি নিয়ে ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে সেখানে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে তারা কাশিমবাজারে আরও একটি কুঠি স্থাপন করে। এরপর ধীরে ধীরে তারা ঢাকা ও মালদহে কুঠি নির্মাণ করে শক্তি বাড়াতে থাকে।

এদিকে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগালের রাজার বোনকে বিয়ে করে মুম্বাই যৌতুক হিসাবে পান। ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে চার্লস বার্ষিক দশ পাউন্ডের বিনিময়ে কোম্পানিকে মুম্বাই ইজারা দেন। বর্তমান মুম্বাই নগর ও বন্দর এখানেই গড়ে উঠে। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে জব চার্নক ভাগীরথী নদীর তীরে ১২০০ টাকার বিনিময়ে কলকাতা, সূতানটি ও গোবিন্দপুর এ তিনটি গ্রামের জমিদারী স্বত্ব কিনে নেন। পরবর্তীকালে উপমহাদেশের ভাগ্য নির্ধারণকারী দুর্গ ফোর্ট উইলিয়াম এখানেই নির্মিত হয়। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট ফররুখশিয়ারের অনুমতি নিয়ে ইংরেজগণ বাংলা, মাদ্রাজ ও মুম্বাইয়ে বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্য করতে থাকে।

ফরাসি

ফ্রান্সের অধিবাসী ফরাসিরা ইউরোপের একটি সুসভ্য জাতি। প্রাচীনকাল থেকেই ফরাসিদের সাথে ইংরেজদের বিরোধ ছিল এবং বর্তমানেও আছে। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র স্থাপনের জন্য ফরাসি বিপ্লব একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা।

উপমহাদেশে ফরাসিদের আগমন সবার শেষে। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি মন্ত্রী কোলবার্টের পৃষ্ঠপোষকতায় 'ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠিত হয় এবং ভারতবর্ষে বাণিজ্য শুরু করে। প্রথমে তারা মুম্বাইয়ের সুরাটে ও পরে পন্ডিচেরীতে কুঠি স্থাপন করে। অল্পদিনের মধ্যেই তারা বাংলার চন্দননগরে আরও একটি কুঠি স্থাপন করে। এছাড়া কারিকল, মসলিপট্টম, কাশিমবাজার এবং বালেশ্বরেও তাদের কুঠি ছিল। ফরাসিরা উপমহাদেশে প্রায় একশ বছর বাণিজ্য করে। ইংরেজগণ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ফরাসিদের চন্দননগর এবং ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে পন্ডিচেরী কুঠি দখল করে নেয়। স্বদেশে ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে বিবাদের জের হিসেবে এখানেও বিবাদ চলতে থাকে। কিন্তু ইংরেজগণ উন্নততর সামরিক শক্তি ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নেয়। পরপর তিনটি কর্ণাটক যুদ্ধে ফরাসিরা পরাজিত হলে ফরাসিদের সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তারের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। ফলে তাদের উপমহাদেশ থেকে বিদায় নিতে হয়।

ভাস্কো-দ্য-গামার পাক-ভারত আগমনের পথা

অন্যান্য কোম্পানি

বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যিক সাফল্যে উৎসাহিত হয় ফান্ডার্সের বণিকগণ 'The Ostend Company', সুইডেনের বণিকগণ 'The Swedish East India Company', অস্ট্রিয়ার বণিকগণ 'The Austrian East India Company' প্রভৃতি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান উপমহাদেশে বাণিজ্য করতে আসে। কিন্তু তারা তেমন সুবিধা করতে পারে নি।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী ক্লাসে উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের সূচনাপর্বের উপর একটি নিবন্ধ লিখবেন।

সারাংশ

প্রাচীনকাল থেকেই স্থল ও জলপথে ইউরোপের দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কে গড়ে উঠেছিল। উপমহাদেশে উৎপাদিত সামগ্রী ইউরোপে সমাদৃত হতো। মধ্যযুগে আরব বণিকগণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে এদেশীয় পণ্য ইউরোপের ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি বন্দরে নিয়ে যেত। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে ভাস্কো-দ্য-গামা যখন উপমহাদেশের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হলেন, তখন উপমহাদেশের সাথে ইউরোপীয় দেশগুলোর বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে এই জলপথ দিয়েই পর্তুগিজ, ডাচ, ইংরেজ, ফরাসি, সুইডিশ, অস্ট্রিয়ান ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণ ক্রমান্বয়ে উপমহাদেশে এসে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন কে?
- ক) ভাস্কো-দ্য-গামা
- খ) বার্থলমিউ দিয়াজ
- গ) আলভারেঞ্জ ক্যাব্রাল
- ঘ) আল বুকার্ক

২। উপমহাদেশে পর্তুগিজ শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে?
- ক) বার্থলমিউ দিয়াজ
- খ) আলভারেঞ্জ ক্যাব্রাল
- গ) আলবুকার্ক
- ঘ) ভাস্কো-দ্য-গামা

৩। এ দেশের অসহায় বালক বালিকাদের জোর করে খ্রিস্টান বানোতা কারা?
- ক) পর্তুগিজরা
- খ) ওলন্দাজরা
- গ) ইংরেজরা
- ঘ) ফরাসিরা

৪। কোন মোগল সম্রাট পর্তুগিজদের এ দেশ থেকে বিতাড়িত করেন?
- ক) আকবর
- খ) জাহাঙ্গীর
- গ) শাহজাহান
- ঘ) আওরঙ্গজেব

৫। বাংলার চুচুড়া ও বাকুঁড়ায় বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে কারা?
- ক) পর্তুগিজরা
- খ) ওলন্দাজরা
- গ) ইংরেজরা
- ঘ) ফরাসিরা

সৃজনশীল প্রশ্ন

রবার্ট ফ্রান্সিস নামক এক নাবিক সমুদ্র পথে তার দেশ থেকে ধন সম্পদে পরিপূর্ণ একটা দেশে আসার জলপথ আবিষ্কার করার পর তার দেশের ব্যবসায়ীরা উক্ত দেশে ব্যবসা করতে এসে সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে ঝুকে পড়ে। তাদের অনুসরণ করে অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ীরাও উক্ত দেশে বাণিজ্য করতে আসে। অন্যান্য দেশ থেকে আগত ব্যবসায়ীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রবার্ট ফ্রান্সিসের দেশের ব্যবসায়ীরা পরাজিত হয়ে এক সময় দেশটি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

ক. কোন দেশের অধিবাসীদের পর্তুগিজ বলা হয়? ১

খ. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিচয় দিন। ২

গ. উদ্দীপকের দেশের ব্যবসায়ীদের মতো কোন দেশের ব্যবসায়ীরা ভারতে বাণিজ্য করতে এসে সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে ঝুকে পড়ে? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. উক্ত দেশের যে নাবিক ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন, তার আগমনের কাহিনী বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৫.২ সিরাজউদ্দৌলা ও পলাশীর যুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- পলাশীর যুদ্ধের কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- পলাশীর যুদ্ধের ফলাফলগুলো বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	আলীবর্দী খান, গিরিয়ার যুদ্ধ, আমেনা, ময়মুনা, ঘষেটি

উপমহাদেশের ইতিহাসে আলীবর্দী খান বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রকৃত নাম মির্জা মুহম্মদ আলী এবং তিনি ছিলেন তুর্কি বংশের।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা

প্রথমে তিনি বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন এবং পরে স্বীয় যোগ্যতা বলে গিরিয়ার যুদ্ধে বাংলার নবাব সরফরাজ খানকে হত্যা করে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবী (১৭৪০ খ্রি.) লাভ করেন। তাঁর রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো মারাঠা ও বর্গীদের দমন করা। তিনি ইংরেজদের সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ ছিলেন।

আলীবর্দী খানের কোনো পুত্র ছিল না; ছিল আমেনা, ময়মুনা ও ঘষেটি নামে তিন কন্যা। ময়মুনা ও আমেনার দুই পুত্র ছিল; কিন্তু ঘষেটি বেগমের কোনো পুত্র ছিল না। আলীবর্দী খান আমেনার পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এ কারণে তাঁকেই তাঁর জীবিতকালে বাংলার নবাব পদে মনোনীত করে যান। সিরাজ ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁর পিতার নাম মির্জা মুহম্মদ হাসিম মইনুদ্দীন খান। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যু হলে সিরাজউদ্দৌলা বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে আরোহণ করেন।

পলাশীর যুদ্ধের কারণ

পলাশীর যুদ্ধের পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ ছিল নিচে তা আলোচনা করা হলো

সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসন আরোহনকে আলীবর্দী খানের অপর দুই কন্যা সহজে মেনে নিতে না পেরে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করেন। এতে ইন্ধন যোগান ঘষেটি বেগমের দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ। সিরাজউদ্দৌলা কৌশলে তাঁর খালা ঘষেটি বেগমকে প্রাসাদে নজরবন্দি করেন ও খালাত ভাই শওকত জঙ্গকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে পূর্ণিয়া দখল করেন।

ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ

সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে পারিবারিক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলেও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র নতুনভাবে শুরু হলো। একদিকে রাজদরবারের প্রভাবশালী দেশীয় রাজন্যবর্গ ও অপরদিকে ইংরেজ বেনিয়ারা। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক জড়িত ছিল। এরা সিরাজের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও ইংরেজদের অবাধ্যতা: বাংলায় বাণিজ্যরত ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় সিরাজের সিংহাসনে আরোহনের পর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী উপঢৌকন প্রদান কিংবা সৌজন্য সাক্ষাৎ পর্যন্ত করে নি; এতে নবাবের প্রতি ইংরেজের অবাধ্যতাই প্রকাশ পায়। ফলে সিরাজ অপমানবোধ করেন।

নবাবের আদেশ অমান্য: নবাব আলীবর্দী খানের সময়ে ইংরেজগণ বাণিজ্য করার অনুমতি পেলেও দুর্গ নির্মাণ করার অনুমতি পায় নি। কিন্তু সিরাজের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধের অজুহাতে ইংরেজরা কলকাতায় এবং ফরাসিরা চন্দনগরে দুর্গ নির্মাণ শুরু করলে সিরাজ তাদের দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করতে আদেশ দেন। ফরাসিরা এ আদেশ মান্য করলেও ইংরেজরা তা অমান্য করে। ফলে নবাব তাদের উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন।

ইংরেজ কর্তৃক শওকত জঙ্গকে সাহায্য: নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে খালা ঘষেটি বেগম ও পূর্ণিয়ার শাসক শওকত জঙ্গ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে ইংরেজরা নবাবের বিরুদ্ধে তাদের সমর্থন করেন। এতে নবাব ইংরেজদের উপর অসন্তুষ্ট হন।

বাণিজ্যিক সুবিধার অপব্যবহার: ইংরেজরা বাণিজ্য শুল্ক ফাঁকি দিয়ে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে অবাধে 'দস্তক' ব্যবহার শুরু করলে এদেশীয় ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বাণিজ্য শর্ত মেনে চলার নির্দেশ প্রদান করলে ইংরেজরা তা অমান্য করে। ফলে নবাব ইংরেজদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন।

সন্ধির শর্ত ভঙ্গ: নবাব সিরাজউদৌলার সাথে সন্ধির যাবতীয় শর্ত ভঙ্গ করে ইংরাজরা জনসাধারণের উপর অত্যাচার শুরু করে ও নবাবকে কর প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে।

ইংরেজ কর্তৃক কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দান: ঘষেটি বেগমের পক্ষ অবলম্বনকারী রাজা রাজাবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস ও তাঁর পরিবার প্রচুর ধনদৌলতসহ কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করে। নবাব সরাসরি কৃষ্ণদাসকে তাঁর নিকট সমর্পণের জন্য নারায়ণসিংহকে দূত হিসেবে ইংরেজদের কাছে পাঠান। কিন্তু, ইংরেজ গভর্নর নবাবের দূতকে অপমানিত করে বের করে দেন ও কৃষ্ণদাসকে ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করেন। ফলে নবাবের ধৈর্যের বাধন ছিঁড়ে যায়।

পলাশীর যুদ্ধ

কলকাতা দখল: নবাব ইংরেজদের ধৃষ্টতায় অতিষ্ঠ হয়ে তাদের শাস্তি দেয়ার জন্য ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুন এক বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে কোলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে নবাব কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি দখল করেন। নবাবের এ অতর্কিত আক্রমণে ভীত হয়ে গভর্নর ড্রেক ও তাঁর সাথীরা ফোর্ট উইলিয়াম ছেড়ে 'ফুলতা' নামক স্থানে আশ্রয় নেয়। ফলে সহজেই সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা দখল করেন ও আলীবর্দী খানের নামানুসারে এর নাম রাখেন 'আলী নগর'। মি. হলওয়েল ও তাঁর সাথীরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হন (২০ জুন ১৭৫৬ খ্রি.) আত্মসমর্পণের পর কোনো ইংরেজের উপর অত্যাচার করা হয় নি।

কথিত আছে নবাবের আদেশে ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দিকে ১৮×১৪ চওড়া বিশিষ্ট ছোট কক্ষে রাখা হয়েছিল। জুন মাসের প্রচণ্ড গরমে এদের মধ্যে

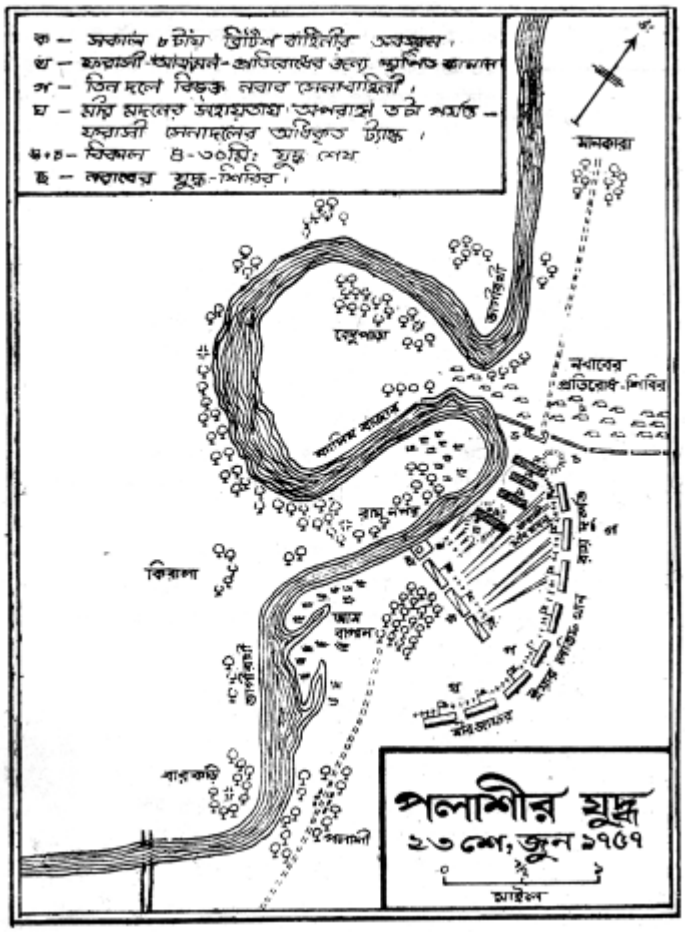

পলাশীর যুদ্ধ

১২৩ জন শ্বাসবন্ধ হয়ে মারা যায়। বাকী ২৩ জন কোনো রকমে বেঁচে যায়। হলওয়েল কর্তৃক প্রচারিত এ কাহিনী 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে পরিচিত। 'অন্ধকূপ-হত্যা' কাহিনীর পেছনে কোনো ঐতিহাসিক সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজদেরকে উত্তেজিত করার জন্য এটি একটি কল্পিত-কাহিনী মাত্র।

আলীনগরের সন্ধি

কলকাতা অধিকার করার পর নবাব সিরাজউদ্দৌলা সেনাপতি মানিক চাঁদকে কলকাতা রক্ষার দায়িত্বে রেখে রাজধানী মুর্শিদাবাদ ফিরে যান। ইতোমধ্যে অন্ধকূপ-হত্যা কাহিনী এবং নবাব কর্তৃক কলকাতা দখলের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছলে ইংরেজ সেনাপতি ওয়াটসন ও রবার্ট ক্লাইভ মানিক চাঁদের নামমাত্র প্রতিরোধ ভেঙ্গে কলকাতা পুনরায় দখল করে নেন।

এ অবস্থায় নবাব চারদিকে ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল লক্ষ করে ইংরেজদের সাথে এক অপমানজনক সন্ধি করতে বাধ্য হন। এ সন্ধিই বিখ্যাত 'আলী নগরের সন্ধি' নামে খ্যাত। এ সন্ধির শর্তানুসারে নবাব দিল্লির সম্রাট কর্তৃক ইংরেজদের প্রদত্ত সকল বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা, যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি প্রদান, টাকশাল নির্মাণ এবং দুর্গ সংস্কার করার অনুমতি প্রদান করেন।

উচ্চাভিলাষী ক্লাইভ এতেও নবাবের প্রতি খুশী হতে পারলেন না। তিনি বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার লক্ষ্যে কতিপয় স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতা লোভী কুচক্রী, দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী দলের সাথে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন।

ক্লাইভ ও মীর জাফরের ষড়যন্ত্র

ইতোমধ্যে ইউরোপে বৃটিশ ও ফরাসিদের মধ্যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হলে সে সূত্র ধরে নবাবের নিষেধ সত্বেও ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ক্লাইভ ফরাসি বাণিজ্য কেন্দ্র চন্দনগর অধিকার করেন। ফলে আত্মরক্ষার্থে ফরাসিরা মুর্শিদাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংরেজদের এ অশোভন উদ্ধত আচরণের জবাব দেয়ার জন্য সিরাজ দাক্ষিণাত্যের ফরাসি সেনাপতি বুসীর সাথে পত্রালাপ করেন। নবাবের এ কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করে ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে সিরাজের পরিবর্তে তার মনোনীত প্রার্থী প্রধান সেনাপতি (আলীবর্দী খানের ভগ্নিপতি) মীর জাফরকে সিংহাসনে বসানোর জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এসব ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ছিলেন ধনকুবের জগৎশেঠ, নবাবের সেনাপতি মীর জাফর ও রায়দুর্লভ, আস্থাভাজন উমিচাঁদ, দেওয়ান রাজবল্লব প্রমুখ। মীর জাফর আলী খান নবাবীর বিনিময়ে ইংরেজদের পৌনে দুই কোটি টাকা প্রদানের অঙ্গীকারে ক্লাইভের সাথে এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। উমিচাঁদ এ গোপন চুক্তির কথা ফাঁস করার ভয় দেখালে ক্লাইভ তাঁকে প্রচুর অর্থ প্রদানের অঙ্গীকারসহ একটি জাল চুক্তি পত্র তৈরি করেন। ওয়াটসন এ জাল চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করলে ক্লাইভ নিজেই তাতে স্বাক্ষর করেন।

লর্ড ক্লাইভ

ক্লাইভের যুদ্ধ ঘোষণা

ষড়যন্ত্র যখন একেবারে পাকা, তখন ক্লাইভ নবাবের বিরুদ্ধে সন্ধি ভঙ্গের মিথ্যা অজুহাতে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। নবাব ইংরেজদের দুরভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপে আগে থেকেই সচেতন ছিলেন। তাই তিনি ৫০টি কামানসহ ৫০ হাজার পদাতিক ও ১৮ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী মুর্শিদাবাদের ২৩ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথী নদীর তীরে মোতায়েনের আদেশ দিলেন। অন্যদিকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুন ক্লাইভ ৮টি কামানসহ ১,০০০ জন ইউরোপীয় ও ২,০০০ জন দেশীয় সৈন্যসহ পলাশীর আম্রকাননে অবস্থান গ্রহণ করলেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ২৩ জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার ভাগ্য পরীক্ষা হয়ে যায়। নবাবের সৈন্যবাহিনী যখন দেশপ্রেমিক মীরমদন ও মোহন লালের আক্রমণে প্রায় পর্যুদস্ত তখন মীর জাফর যুদ্ধক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। এ সময় হঠাৎ মীরমদন গোলার আঘাতে নিহত হলে মোহন লাল ও ফরাসি সেনাপতি সিনফ্রে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। মীরমদনের মৃত্যু সংবাদে নবাব বিচলিত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রধান সেনাপতি মীর জাফরকে ডেকে পাঠান এবং বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মীর জাফরকে অনুরোধ করেন। বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর কুরআন স্পর্শ করে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার মিথ্যা শপথ করেন। এদিকে মোহনলাল ও সিনফ্রের বাহিনী যখন নবাবের বিজয়কে সুনিশ্চিতের পথে নিয়ে যায়, ঠিক সেই মুহূর্তে মীর জাফরের পরামর্শে নবাব যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিয়ে বিরাট ভুল করেন।

রণক্লান্ত নবাব বাহিনী যখন রাত্রিতে বিশ্রামরত তখন মীর জাফরের ইঙ্গিতে ইংরেজ বাহিনী নবাব শিবির আক্রমণ করে সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ফলে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে নবাব পরাজিত হয়ে পুনরায় মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

অবশেষে নবাব স্ত্রী লুৎফুননেসা ও কন্যাকে নিয়ে নৌকাযোগে পলায়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজমহলের পথে ভগবান গোলায় ধৃত ও বন্দি হন। তাঁদের মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসা হয়। পরে মীর জাফরের পুত্র মীরনের আদেশে মোহাম্মদী বেগ নবাবকে হত্যা করে।

এভাবেই পলাশীর প্রান্তরে দেশ প্রেমের পরাজয় হলো, আর বিশ্বাসঘাতকদের জয় হলো। এর ফল হিসেবে ইংরেজদের সমগ্র উপমহাদেশের বিজয়ের পথ প্রশস্ত হলো।

মীর জাফর কর্তৃক যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা

নবাবের পতনের কারণ

পলাশীর যুদ্ধকে একটি বিরাট ও ভয়াবহ যুদ্ধ না বলে একটি খণ্ড যুদ্ধ বলা যায়। কারণ এ যুদ্ধের পরিস্থিতি ও গুরুত্ব বিচার করলে এ যুদ্ধকে কখনই বিরাট যুদ্ধ রূপে চিহ্নিত করা যায় না। পলাশীর যুদ্ধে নবাব বাহিনীর পরাজয়ের পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ ছিল ঃ

প্রথমত: মীর জাফর ও তার সহযোগীদের বিশ্বাসঘাতকতাই ছিল নবাবের পতনের প্রধান কারণ। বিজয়ের মুহূর্তে প্রধান সেনাপতি হিসাবে তিনি নবাবকে ভুল পরামর্শ দেন ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন।

দ্বিতীয়ত: তরুণ নবাবের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার অভাব এবং মাতামহের অত্যাধিক স্নেহ প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত পালিত হওয়ায় সিরাজের চরিত্রে কঠোরতা ও দৃঢ়তার অভাব ছিল। ফলে তাৎক্ষণিক পরিস্থিতির মুখে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন এবং ষড়যন্ত্রের খবর পাওয়া সত্বেও তিনি দুর্বলতার কারণে কারও বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সাহসী হন নাই।

তৃতীয়ত: যুদ্ধক্ষেত্রে সুনিশ্চিত বিজয়কে উপেক্ষা করে নবাবের যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা তাঁর সমরনীতির অপরিপক্কতার ও পরনির্ভরশীলতার পরিচয় বহন করে যা তাঁর পতনকে তরান্বিত করে।

চতুর্থত: এ সময় মানুষের মধ্যে চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব দেখা দিয়েছিল। ফরাসিরা তাঁর বিরুদ্ধে ইংরেজদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁকে হুঁশিয়ার করে দেয়ার পরেও তিনি তাতে কর্ণপাত করেন নি। নবাব আলীবর্দী খানও মৃত্যুর আগে সিরাজকে ইংরেজদের শক্তি বৃদ্ধি সম্পর্কে সতর্ক করে যান।

পঞ্চমত: কর্মচারী, সভাসদ, সেনাপতি, ব্যবসায়ী, ধনকুবের ও সৈন্যরা নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিতেও দ্বিধাবোধ করে নি।

ষষ্ঠত: সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক রবার্ট ক্লাইভ সূক্ষ্ম কূটনীতি, উন্নত রণকৌশল এবং রণসম্ভারে নবাব অপেক্ষা অনেক বেশি পারদর্শী ছিলেন। ফলে ক্লাইভের নিকট নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় অবধারিত ছিল।

পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল

উপমহাদেশের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ একটি বেদনাবহুল খণ্ড যুদ্ধ হলেও এ যুদ্ধের ফলাফল ছিল সদূরপ্রসারী। বিশেষ করে, এ যুদ্ধের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

প্রথমত: পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার অকাল মৃত্যু হলে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য দীর্ঘদিনের জন্য অস্তমিত হয়।

দ্বিতীয়ত: এ যুদ্ধের ফলে মীর জাফর নামে মাত্র নবাব হলেন, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা রইলো ক্লাইভের হাতে।

তৃতীয়ত: পলাশীর যুদ্ধের পর উপমহাদেশে ইংরেজদের সার্বভৌমত্ব স্থাপিত না হলেও তারা নতুন নবাবের কাছ থেকে নগদ এক কোটি টাকা এবং চব্বিশ পরগনার বিশাল জমিদারী লাভ করেন। ফলে বাংলার রাজনীতিতে ইংরেজদের যখন তখন হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত হয়।

চতুর্থত: এ যুদ্ধের ফলে ইংরেজগণ বাংলায় একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করেন আর এদেশীয় বণিকদের সমাধি রচিত হয়।

পঞ্চমত: এ যুদ্ধে বিজয়ের ফলে ইংরেজরা বাংলাসহ দাক্ষিণাত্যে প্রভাববিস্তার করে ফরাসি বণিকদের বিতাড়িত করে এবং একচেটিয়াভাবে উপমহাদেশের সম্পদ আহরণ ও ইংল্যান্ডে প্রেরণের ফলে এদেশের আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়।

ষষ্ঠত: ঐতিহাসিক আর.সি. মজুমদার বলেন, "পলাশীর যুদ্ধ বাংলা তথা সমগ্র উপমহাদেশে ইংরেজদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। কালক্রমে বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪ খ্রি.) তারা নবাব মীর কাসিম ও মুগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে পরাজিত করে সমগ্র উপমহাদেশের শাসনভার গ্রহণ করে।

সপ্তমত: এ যুদ্ধের ফলে ইংরেজদের সামরিক শক্তি ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে জনগণের মনে উচ্চ ধারণার সৃষ্টি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়।

অষ্টমত: পলাশীর যুদ্ধের পর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে উপমহাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হয়। "১৭৫৭ সালের ২৩ জুন তারিখে উপমহাদেশের মধ্যযুগ শেষ আধুনিক যুগের পত্তন হয়েছিল।"

শিক্ষার্থীর কাজ	পলাশী যুদ্ধের কারণগুলো লিপিবদ্ধ করবেন।

সারাংশ

উপমহাদেশে ইংরেজদের আগমন, বাণিজ্য, সাম্রাজ্য স্থাপন, শাসন-শোষণ এদেশবাসীর জন্য এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। এ অধ্যায় ষড়যন্ত্রের, বিশ্বাসঘাতকতার, শঠতার ও শাসন শোষণের অধ্যায়। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজগণ কোনো রণ দক্ষতার দরুন নয় বরং এদেশীয় কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারীদের দরুনই তাদের কর্তৃত্বের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করে। পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরেজ কর্মকর্তারা বিপুল ধন-সম্পদের মালিক হন যা তাঁদের উপমহাদেশব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনে সহায়ক হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কত খ্রিস্টাব্দে মসনদে বসেন?
ক) ১৭৫৫ খ) ১৭৫৬ গ) ১৭৫৭ ঘ) ১৭৫৮

২। 'অন্ধকুপ হত্যা' নামক কল্প কাহিনীর জনক কে?
ক) হলওয়েল খ) ড্রেক গ) রবার্ট ক্লাইভ ঘ) ওয়াটসন

৩। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন–
ক) ওয়াটসন খ) ক্লাইড গ) সিনফ্রে ঘ) কর্নওয়ালিস

৪। উপমহাদেশে মধ্যযুগের শেষ এবং আধুনিক যুগের পত্তন হয় কত খ্রিস্টাব্দে?
ক) ১৭৫৫ খ) ১৭৫৬ গ) ১৭৫৭ ঘ) ১৭৫৮

৫। পলাশীর যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের কারণ ছিল–
i. মীর জাফর ও তার সহযোগীদের বিশ্বাস ঘাতকতা
ii. নবাবের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার অভাব
iii. নবাবের অপরিপক্ক সমরজ্ঞান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৩ রবার্ট ক্লাইভ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- রবার্ট ক্লাইভের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের বিবরণ দিতে পারবেন।
- সেনাপতি, শাসক ও এদেশে ইংরেজ শক্তির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে রবার্ট ক্লাইভের কৃতিত্বের বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	কোর্ট অব ডাইরেকটরস, এলাহাবাদ চুক্তি,

উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে রবার্ট ক্লাইভের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তরুণ বয়সে মাদ্রাজে (বর্তমান চেন্নাই) ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকুরী গ্রহণ করে স্বীয় কর্ম প্রচেষ্টার দ্বারা উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। বস্তুত তাঁর অসাধারণ সাহস, সংকল্প ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ফলেই এদেশে বাণিজ্যরত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শেষ পর্যন্ত শাসকের মর্যাদা লাভ করে।

১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে শাসন সংস্কার

বক্সারের যুদ্ধের পর কোম্পানির হাতে ক্ষমতা চলে আসে। ধীরে ধীরে কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে বিশৃংখলা ও দুর্নীতি চরমে উঠে। এ অবস্থায় ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ পুনরায় লর্ড ক্লাইভকে পূর্ণ ক্ষমতা দান করে দ্বিতীয়বার বাংলায় প্রেরণ করে। (১৭৬৫-৬৭ খ্রি.)। কাজেই এদেশে এসে তাঁর প্রধান কাজ হলো 'আভ্যন্তরীণ সংস্কার' সাধন করা। এ উদ্দেশ্যে তিনি কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

প্রথমত: তিনি কোম্পানির কর্মচারীদের পক্ষে সকল প্রকার উপহার বা উৎকোচ গ্রহণ একেবারে নিষিদ্ধ করেন।

দ্বিতীয়ত: তিনি কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের অধিকার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেন। পাশাপাশি কোম্পানির ক্ষতিগ্রস্থ অল্প বেতনভোগী কর্মচারীদের লবণ, সুপারী এবং তামাকের একচেটিয়া ব্যবসা করার জন্য একটি 'বাণিজ্য সমিতি' গঠন করেন। এ প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে পর্যায় অনুযায়ী ভাগ করে দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়। একচেটিয়া ব্যবসায়ের ফলে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণেরও দুঃখ দুর্দশা বাড়ে। অবশেষে এ বাণিজ্য সমিতির কাজকর্ম পছন্দ না হওয়ায় 'কোর্ট অব ডাইরেকটরস্' ক্লাইভকে তা প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন।

তৃতীয়ত: পলাশীর যুদ্ধের পর হতে সৈন্যদের শান্তির সময়েও দ্বিগুণ ভাতা দেয়া হতো। সেনা-বিভাগের খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে লর্ড ক্লাইভ এ ভাতা বন্ধ করে দিলে সেনাবিদ্রোহ দেখা দেয়। তবে তা তিনি কঠোর হাতে দমন করেন। এতে তিনি বহুল প্রশংসিত হন।

ইংরেজ ক্ষমতার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে

দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর উপমহাদেশে ইংরেজ শক্তি এক বিশেষ দুর্যোগের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিল। এ দুর্দিনে ক্লাইভ আর্কট দখল করে দাক্ষিণাত্যে ইংরেজের সম্মান রক্ষা করেন। (১৭৫৯ খ্রি.) ইংরেজের এ বিজয় উপমহাদেশে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পথ নির্দেশক হিসেবে কাজ করে।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভের কূটনীতির জন্যই পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ পতাকা উত্তোলন সম্ভব হয়েছিল। এ বিজয় ইংরেজ শাসনের ভিত্তিকে সুনিশ্চিতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলার এ অর্থ-সম্পদ ও জনবল চিরশত্রু ফরাসিদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয় যা বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারে ইংরেজদের সহায়ক হয়েছিল।

লর্ড ক্লাইভের দিওয়ানি লাভ

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাথে এলাহাবাদ চুক্তি স্বাক্ষর করলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিউয়ানি লাভ করে দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করে। মধ্যবর্তী রাজ্য হিসেবে কোম্পানি ও মারাঠাদের মধ্যে অযোধ্যা রাজ্যকে প্রতিষ্ঠা করে ক্লাইভ ইংরেজ বিরোধী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধেও এক শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। উপরন্তু ভাতা প্রদান করে সম্রাট ও নবাবকে নিয়ন্ত্রণে আনার ফলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক হতে একক-ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসে। লর্ড ক্লাইভ উপমহাদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা পেলেও বাংলায় জালিয়াতি এবং উৎকোচ গ্রহণের অপরাধে স্বদেশবাসী তাঁর বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে বহু অভিযোগ উত্থাপন করেন। অবশেষে পার্লামেন্টে নির্দোষ প্রমাণিত হলেও ইংল্যান্ডবাসীর ধিক্কারে অতিষ্ঠ হয়ে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে স্বগৃহে ক্লাইভ আত্মহত্যা করেন।

কৃতিত্ব

রবার্ট ক্লাইভের চারিত্রিক দোষ থাকা সত্বেও উপমহাদেশে ইংরেজ শক্তির গোড়াপত্তনে তাঁর অবদান অস্বীকার করা যায় না। কোম্পানির অধীনে সামান্য কেরানী হিসেবে ক্লাইভ এদেশে তাঁর কর্ম জীবন শুরু করলেও নিজ মেধা ও প্রতিভাবলে লর্ড উপাধীতে ভূষিত হন এবং বাংলার গর্ভনরের পদটি লাভ করেন। তিনি অসীম সাহসিকতার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে ইংরেজদের সংকটময় মুহূর্তে আর্কট অভিযান করে তাঁদের রক্ষা করেন। তাঁর কূটনৈতিক বুদ্ধির ফলে পলাশীতে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য ডুবে যায়। ফলে, এদেশে বনিকের মানদণ্ড রাজদন্ডে পরিণত হয়। দ্বিতীয়বার গভর্নর হিসেবে তিনি সামরিক ও বে-সামরিক ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করে কোম্পানির আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা ও দুর্নীতি দূর করেন। কিন্তু শাসনকাজে তাঁর দূরদর্শিতা না থাকার ফলে তাঁরই প্রবর্তিত দ্বৈত শাসন এদেশের জন্য চরম দুর্ভোগ ও মৃত্যু ডেকে আনে। নবাব ও সম্রাটের সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক মৈত্রী স্থাপন তাঁর কূটনৈতিক জ্ঞানের অন্যতম পরিচায়ক।

চরিত্র

রবার্ট ক্লাইভ একজন সাহসী, স্থিরবুদ্ধি, দৃঢ় ও কর্মকুশল সম্পন্ন চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত অর্থলোলুপ ছিলেন এবং নিজ ও স্বদেশের স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁর কোনো সততাবোধ, বিচারবোধ ও নীতিবোধ ছিল না। যেমন ঃ নবাবের নিকট থেকে উৎকোচ গ্রহণ, উমিচাঁদের সাথে জাল-সন্ধি স্বাক্ষর, দস্তক ব্যবহারে বাংলার সম্পদ অপহরণ এবং জনসাধারণের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন প্রভৃতি কাজগুলো তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক এঁকে দিয়েছে। এ প্রসংগে পার্সিভাল স্পিয়ার বলেন, "অরণ্যের পশু-পক্ষীর চোরাই শিকারীকে অরণ্যের প্রাণী সম্পদের রক্ষক করা হয়।" জনস্টন বলেন, "উপঢৌকন গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের সামনে স্বয়ং ক্লাইভের সম্মানিত দৃষ্টান্ত আছে।"এ সকল দোষ-ত্রুটি থাকা সত্বেও এ কথা স্বীকার করতে হয় রবার্ট ক্লাইভই উপমহাদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন করেছিলেন। তাই উপমহাদেশের ইতিহাসে রবার্ট ক্লাইভের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	রবার্ট ক্লাইভের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের বিবরণ দিতে চেষ্টা করবেন।

সারাংশ

উপমহাদেশের ইতিহাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থপতি ও প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে লর্ড ক্লাইভের নাম অবিস্মরণীয়। কেননা প্রথম পর্যায়ে তিনি দাক্ষিণাত্যে কোম্পানিকে রক্ষা করেন; দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি বাংলা জয় করেন। তৃতীয় পর্যায়ে তিনি নবাব ও সম্রাটকে নিয়ন্ত্রণ করে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন এবং ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ক্লাইভের কৃতিত্বের মূলে তাঁর তেজস্বীতা, সাহসিকতা, কূটবুদ্ধিতা, কর্মকুশলতা বিশেষভাবে কাজ করেছিল। কিন্তু তা সত্বেও তিনি সম্মান পান নি তাঁর নিজ দেশে। কারণ তিনি ছিলেন অতিশয় অর্থলোলুপ, নীতিবোধ বিবর্জিত এক মানুষ। শাসন কাজেও তাঁর দূরদর্শিতা দেখা যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কে?

ক) রবার্ট ক্লাইভ খ) কার্টিয়ার গ) ওয়াটসন ঘ) কর্নওয়ালিস

২। কত খ্রিস্টাব্দে ক্লাইভ দ্বিতীয় বার বাংলায় আসেন?
ক) ১৭৬৪ খ) ১৭৬৫ গ) ১৭৬৬ ঘ) ১৭৬৭

৩। "অরণ্যের পশু পক্ষীর চোরাই শিকারীকে অরণ্যের প্রাণী সম্পদের রক্ষক করা হয়।" উক্তিটি করেন কে?
ক) পার্সিভাল স্পিয়ার খ) জনস্টন গ) কর্নওয়ালিস ঘ) হোস্টিংস

উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে শান্তির সময়েও সৈন্যদের দ্বিগুণ ভাতা দেয়া হতো। সেনা বিভাগের খরচ কমানোর জন্য সৈন্যদের এ ভাতা বন্ধ করে দিলে সেনা বিদ্রোহ দেখা দেয়।

৪। উদ্দীপকের সেনা বিদ্রোহ দমন করেন কে?
ক) কার্টিয়ার খ) মনরো গ) ক্লাইড ঘ) ওয়াটসন

৫। উক্ত নেতার কুট কৌশলের কারণেই–
i. পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ পতাকা উত্তোলন সম্ভব হয়
ii. ইংরেজ শাসনের ভিত্তি সুনিশ্চিত হয়
iii. কোম্পানী বাংলা বিহার উড়িষ্যার দিউয়ানী লাভ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৪ মীর কাশিম ও বক্সারের যুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার শেষ প্রচেষ্টাকারী হিসেবে নবাব মীর কাশিম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বক্সার-যুদ্ধের পটভূমি বা কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বক্সার যুদ্ধের গুরুত্ব বা ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	মীর কাশিম, বক্সারের যুদ্ধ, বিশ্বাসঘাতকতা, মসনদ

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করার পুরস্কার স্বরূপ বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর বাংলার মসনদ লাভ করেন। কিন্তু রাজকোষ শূন্য থাকায় মীর জাফর তাঁর ব্যক্তিগত স্বর্ণালঙ্কার, হীরা, জহরত ও মূল্যবান আসবাবপত্র বিক্রি করে প্রতিশ্রুত দেড়কোটি টাকা দিতে ও দরবারে ইংরেজ রেসিডেন্ট রাখার অনুমতি দিতে বাধ্য হন। ফলে তিনি দেউলিয়া হয়ে ইংরেজ নির্ভর হয়ে পড়েন। এদিকে ঢাকা ও পূর্ণিয়ায় সেনাবিদ্রোহ দেখা দেয়, ক্লাইভের সাহায্যে ঢাকার বিদ্রোহ দমন করা হয়। তবে বকেয়া বেতনের দাবিতে সংঘটিত পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমন সম্ভব হয় নি। মীর জাফর নবাবী পেলেও প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ কিংবা ভোগ করার ভাগ্য তার জোটে নি। এ কারণে মীর জাফর উদ্ধত ইংরেজদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করতে খানিকটা প্রয়াস নেন। কিন্তু তার অযোগ্যতা, ওলন্দাজদের সঙ্গে পত্রালাপ এবং প্রতিশ্রুত অতিরিক্ত অর্থ না দেয়ার অজুহাতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অস্থায়ী গভর্নর ভ্যান্‌সিটিটির প্রস্তাবক্রমে মীর জাফরকে সিংহাসনচ্যুত করা হয় (১৭৬০ খ্রি.)।

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা মীর জাফরের জামাতা মীর কাশিমকে বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত করেন। অবশ্য তিনিও কোম্পানিকে অনেক সুবিধাদানের শর্ত সাপেক্ষে ক্ষমতা লাভ করেন। মীর কাশিম মীর জাফরের মতো অপদার্থ, অযোগ্য ও হীন চরিত্রের ছিলেন না। তিনি একজন সুদক্ষ শাসক, দূরদর্শী রাজনীতিবিদ এবং স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন। জনসাধারণের কল্যাণের প্রতি তিনি সচেতন ছিলেন। তাই তিনি ইংরেজদের সাথে সম্মানজনক উপায়ে বাংলার স্বার্থ রক্ষা করে আর্থিক ও সামরিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে চেয়েছিলেন, যা হীন চরিত্রের অধিকারী মীর জাফরের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি। কিন্তু শেষ

পর্যন্ত নানাবিধ কারণে নবাব মীর কাশিমও বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। তাই বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ আধিপত্য উপমহাদেশের গভীরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে বাংলার স্বাধীন হওয়ার শেষ আশাটুকু নিভে যায়।

বক্সার যুদ্ধের কারণ

মীর কাশিম বাংলার মসনদে আরোহণ করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ইংরেজদের সাথে ভবিষ্যতে তাঁর সংঘর্ষ সুনিশ্চিত। কারণ মীর কাশিম ছিলেন- মীর জাফরের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ইংরেজদের সাথে ঝগড়া করার ইচ্ছা তাঁর না থাকলেও ইংরেজদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে থাকার মতো হীন মনোবৃত্তি তাঁর ছিল না। তাই তিনি প্রকৃত নবাব হিসেবে দেশ শাসন করতে চেয়েছিলেন। ফলে তিনি দেশ, জাতি ও স্বীয় স্বার্থে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যা বক্সারের যুদ্ধের কারণে পরিণত হয়।

১. সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ

রাজধানী স্থানান্তর

দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন বলে সিংহাসনে বসেই মীর কাশিম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে এদেশে ইংরেজদের রাজনৈতিক-হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে না পারলে ভবিষ্যতে তারাই যে এদেশের ভাগ্য বিধাতা হয়ে দাঁড়াবে। রাজধানীতে ইংরেজ রেসিডেন্টের শাসনকার্যে অবৈধ হস্তক্ষেপ স্বাধীনচেতা মীর কাশিমের নিকট অসহনীয় ছিল। তাই প্রশাসনকে ইংরেজ প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং চারপাশে পরিখা-খনন করে ও দুর্গ নির্মাণ করে রাজধানীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।

মীর কাশিমের মনে হয়েছিল যে ইংরেজরা পুনরায় মীর জাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসাতে পারে। সুতরাং তাঁকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়েছিল। তাই ইংরেজদের সম্ভাব্য আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য মীর কাশিম সামরু ও মার্কার নামে দু'জন ইউরোপীয় সৈনিকের সাহায্যে নিজ বাহিনীকে ইউরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন।

অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে তিনি কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ হতে স্বাধীন থাকার জন্য মুঙ্গেরে কামান, বন্দুক ও গোলাবারুদ নির্মাণের ব্যবস্থাও করেন।

বিহারের শাসনকর্তা রামনারায়ণের ইংরেজ প্রীতি ও দুর্নীতি লক্ষ করে মীর কাশিম তাঁকে পদচ্যুত ও তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলে মীর কাশিমের এ সমস্ত কার্যাবলি ইংরেজদের মনে অসন্তোষ ও সন্দেহের সৃষ্টি করে। ফলে তা যুদ্ধের অন্যতম কারণ হয়ে দেখা দেয়।

২. বাদশাহী ফরমানের অবমাননা

১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মুগল সম্রাট ফররুখ শিয়ার কর্তৃক প্রদত্ত ফরমান বলে কোম্পানি বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। কিন্তু এ ফরমান অমান্য করে কোম্পানির অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী 'দস্তক' নামক ছাড়পত্রে মাল আমদানি বা রপ্তানি বাণিজ্য সংক্রান্ত কথাটি লিখিয়ে বিনা শুল্কে কোম্পানির মাল একস্থান থেকে অন্যস্থানে আনা নেয়া করতো। এ সমস্ত 'দস্তক' স্বাক্ষরের ভার নবাব কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারির উপর দেন। ফলে দেশীয় বণিকগণ ব্যবসা ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং নবাব নিজেও প্রাপ্য বাণিজ্য শুল্ক হতে বঞ্চিত হতে থাকেন।

৩. অবাধ বাণিজ্যের প্রচলন

অবৈধভাবে এ আন্তঃবাণিজ্য চলতে থাকায় দেশীয় বণিকরা ইংরেজ বণিকদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে অসমর্থ হয়। মীর কাশিম এ বিষয়ে গভর্নরের কাছে প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু নবাব প্রতিকার না পেয়ে ইংরেজ ও দেশীয় ব্যবসায়ী নির্বিশেষে সকল ব্যবসায়ীদের উপর থেকে বাণিজ্য শুল্ক উঠিয়ে দেন। এতে নবাবের রাজস্ব আয় কমে গেলেও দেশীয় বণিকদের সাথে বিদেশি বণিকদের অন্যায় প্রতিযোগিতার পথ বন্ধ হয়ে যায়। এ নতুন ব্যবস্থার ফলে ইংরেজদের স্বার্থে আঘাত লাগে।

বক্সারের যুদ্ধ

প্রথমেই কলকাতা ইংরেজ কুঠিরের অধ্যক্ষ এলিসের সঙ্গে নবাবের সংঘর্ষ শুরু হয়। অধ্যক্ষ এলিস হঠাৎ পাটনা আক্রমণ করে তা দখল করে নেন। ফলে বাধ্য হয়ে নবাবকে এলিসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হয়। মীরকাশিম পাটনা হতে এলিসকে বিতাড়িত করে পাটনা পুনরুদ্ধার করলে কোলকাতা-কাউন্সিল নবাবের বিরুদ্ধে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মেজর এডামসের নেতৃত্বে ইংরেজরা নবাবের বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু নবাব তাঁর সৈন্য সংখ্যা

বেশি থাকা সত্ত্বেও গিরিয়া, কাটোয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে (১৭৬৩ খ্রি.) শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে অযোধ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ইংরেজগণ আবার মীর জাফরকে পুতুল নবাব হিসেবে বাংলার সিংহাসনে বসালেন। নতুন নবাব মীর জাফর মীর কাশিম কর্তৃক জারীকৃত সকল ঘোষণা ও বিধি প্রত্যাহার করে নিলেন। এতে ইংরেজরা আবার প্রমাণ করলো যে তারাই বাংলার সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস এবং নবাব বানানোর ও নামানোর মালিক।

মীর কাশিম পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও হাল ছাড়েন নি। অতঃপর মীরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুগল সম্রাট শাহ আলমের সহায়তায় ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক চরম শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু বিহারের বক্সার নামক স্থানে মিলিত বাহিনী মেজর মনরোর হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

ফলাফল বা গুরুত্ব

বক্সারের যুদ্ধ বাংলা তথা উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি সুদূরপ্রসারী ফল এনে দিয়েছিল। এ যুদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে।

১. এ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে দিল্লির মোগল সম্রাট শাহ আলম ইংরেজদের পক্ষে যোগদান করেন।
২. অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা রোহিলাখণ্ডে পালিয়ে গেলেন।
৩. মীর কাশিম আত্মগোপন করলেন। অবশেষে ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সন্নিকটে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।
৪. এ যুদ্ধের ফলে মীর কাশিমের ইংরেজ বিতারণ ও স্বাধীনতা রক্ষার শেষ আশা-ভরসাটুকুও ধূলিসাৎ হয় এবং উপমহাদেশে ইংরেজ প্রভাব ও মর্যাদা বহুগুণে বেড়ে যায়।
৫. এ যুদ্ধের ফলে উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও বিনা বাধায় ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের পথ উন্মোচিত হয়।
৬. কোম্পানি অযোধ্যার নবাবের নিকট থেকে কারা ও এলাহাবাদ অঞ্চল দু'টি কেড়ে নেয়।
৭. এ যুদ্ধে কেবল মীর কাশিম পরাজিত হন নি; স্বয়ং সম্রাট শাহ আলম ও সুজাউদ্দৌলাও পরাজিত হয়েছিলেন। ফলে দিল্লি থেকে বাংলা পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত ইংরেজদের অধীনে চলে যায়।
৮. এ যুদ্ধের ফলে ক্লাইভ দিল্লিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্রাটের কাছ থেকে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানী (রাজস্ব আদায়ের কর্তৃত্ব) লাভ করেন। ফলে বাংলায় ইংরেজ অধিকার আইনত স্বীকৃত হয় ও কোম্পানি অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়।
৯. ঐতিহাসিক জেম্‌স স্টিফেন্স বলেন, "বৃটিশ শক্তির উৎপত্তি হিসেবে উপমহাদেশে পলাশির যুদ্ধ অপেক্ষা বক্সারের যুদ্ধ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।" কারণ- মীর কাশিমের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নবাবী আমল শেষ হয়ে যায় এবং পরবর্তী ঘটনাবলি ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সংগঠনের যুগ।

শিক্ষার্থীর কাজ	বক্সারের যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ ধারাবাহিকভাবে লিখবেন।

সারাংশ

পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের সাহায্য করার পুরস্কার স্বরূপ বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর বাংলার সিংহাসন লাভ করেও প্রকৃত নবাব হতে পারেন নি। ইংরেজদের ক্রমাগত চাহিদা মেটাতে অক্ষমতা প্রকাশ করলে ইংরেজ গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মীর জাফরকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর জামাতা মীর কাশিমকে শর্ত সাপেক্ষে বাংলার সিংহাসনে বসান। স্বাধীনচেতা মীর কাশিম ইংরেজদের বাংলার স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে ইংরেজরা তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে এবং ভেতরে ভেতরে নিজেরাও প্রস্তুত হতে থাকে। এ সময় গভর্নর এলিস হঠাৎ করে পাটনা দখল করলে মীর কাশিম তা পুনরুদ্ধার করেন। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা কাউন্সিল যুদ্ধ ঘোষণা করলে মীর কাশিম গিরিয়া, উদয়নালা ও কাটোয়ার যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি এডামসের হাতে পরাজিত হন। পরবর্তী সময়ে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাহায্য লাভ করেও বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪ খ্রি.) পুনরায় তিনি ইংরেজ সেনাপতি মেজর মনরোর হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে বাংলার নবাবের অবশিষ্ট মর্যাদাটুকুও অবলুপ্ত হয়ে যায়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে মীরজাফরের মৃত্যু হলে ইংরেজগণ তাঁর পুত্র নজমুউদ্দৌলাকে নাম মাত্র নবাবী দিলেন বটে, তবে প্রকৃত ক্ষমতা থাকলো কোম্পানির হাতে। পরবর্তী সময়ে সম্রাট ২৬

লক্ষ টাকা রাজস্বের বিনিময়ে কোম্পানিকে বাংলার বিহার উড়িষ্যার দিউয়ানীর দায়িত্ব দেন। এভাবে বক্সারের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে চূড়ান্তভাবে বাংলার স্বাধীনতা ইংরেজরা গ্রাস করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মীর কাশিম কত খ্রিস্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে বসেন?
ক) ১৭৬০ খ) ১৭৬১ গ) ১৭৬২ ঘ) ১৭৬৩

২। কত খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
ক) ১৭৬২ খ) ১৭৬৩ গ) ১৭৬৪ ঘ) ১৭৬৫

৩। বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের সেনাপতি ছিলেন–
ক) এলিস খ) মনরো গ) এডামস ঘ) হলওয়েল

৪। মীর কাশিম রাজধানী স্থানান্তর করেন কোথায়?
ক) মুঙ্গেরে খ) পাটনায় গ) কলকাতায় ঘ) উদয়নালায়

উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

ইংরেজদের একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গিয়ে ইংরেজ ও এ দেশিয় ব্যবসায়ী নির্বিশেষে সকল ব্যবসায়ীর উপর থেকে বাণিজ্য শুল্ক উঠিয়ে দেয়া হয়।

৫। উদ্দীপকের বাণিজ্য শুল্ক উঠিয়ে দেন কে?
ক) মীর কাশিম খ) মীর জাফর গ) নজুমদ্দৌলা ঘ) রামনারায়ন

৬। উক্ত নবাব রাজধানীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন–
i. রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করে
ii. রাজধানীর চারদিকে পরিখা খনন করে
iii. দুর্গ নির্মাণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৫ কোম্পানির দিউয়ানি লাভ ও এর ফলাফল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দিউয়ানি বলতে কী বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ক্লাইভ কী ভাবে দিউয়ানি লাভ করলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ক্লাইভের দিউয়ানি লাভের ফলাফল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	খাজনা, বিচার, প্রতিরক্ষা, প্রশাসন

পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং বক্সারের যুদ্ধে নবাব মীরকাশিম পরাজিত হওয়ার পর ইংরেজদের গতিরোধ করার মতো শক্তি ও সাহস এদেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর তখন থেকেই বাংলার শাসন ব্যবস্থায় ইংরেজরা সরাসরি হস্তক্ষেপ শুরু করে এবং বাংলার ভাগ্যবিধাতা হয়ে যায়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে কিভাবে ইংরেজগণ এই সরাসরি হস্তক্ষেপের ক্ষমতা লাভ করে? এ প্রসংগে বলা দরকার যে, মুগল শাসনতন্ত্রে প্রদেশ শাসনের জন্য দু'টি সমপর্যায়ের পদের বিধান ছিল। একটি সুবাদারী, আরেকটি দিউয়ানি। সুবাদার ও

দিউয়ান উভয় ব্যক্তিই সরাসরি দিল্লির সম্রাটের নিকট ব্যক্তিগতভাবে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন। তাঁরা একে অপরকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতেন, কিন্তু একে অন্যকে তাঁর অধীন করতে পারতেন না। সুবাদারের দায়িত্ব ছিল বিচার, প্রতিরক্ষা ও সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা, আর দিউয়ানের দায়িত্ব ছিল মূলত রাজস্ব (খাজনা) শাসন। তাই দিওয়ানী লাভের অর্থ রাজস্ব আদায়ের কর্তৃত্ব লাভ করা। কোনো প্রাদেশিক শাসনকর্তা যেন স্বেচ্ছাচারী ও স্বাধীনতাকামী হয়ে না পড়ে সে উদ্দেশ্যেই এ ক্ষমতা বিভাজনের ব্যবস্থা ছিল। প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জনও ছিল এই ব্যবস্থার আর এক লক্ষ্য।

মুর্শিদকুলী খানের (১৭১৭ খ্রি.) সুবাদারী লাভ পর্যন্ত সুবাদারী ও দিউয়ানের পদ পৃথক পৃথক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত ছিল। মুর্শিদকুলী খানই প্রথম যিনি মুগল শাসনতান্ত্রিক প্রথা ভঙ্গ করে দিউয়ানের পদটিও নিজে দখল করে নেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রের দুর্বলতার সুযোগে মুর্শিদকুলি খানের পরবর্তী সব সুবাদারগণই সুবাদারী ও দিউয়ানীর পদ একত্রীভূত রাখেন। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সুবে বাংলা প্রায় স্বাধীনভাবে শাসিত হতে থাকে।

মারাঠা উৎপাতের কারণে আলীবর্দ্দী খান কেন্দ্রকে রাজস্ব পাঠানো প্রায় বন্ধ করে দেন। সিরাজউদ্দৌলা ও মীরজাফরের আমলে কেন্দ্রকে রাজস্ব দেয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। পলাশীর যুদ্ধের পর হতে কোম্পানি ছিল দেশের হর্তাকর্তা। কেন্দ্রীয় রাজনীতি তথা সমগ্র উপমহাদেশের রাজনীতি এমনভাবে পরিবর্তিত হচ্ছিল যে, সুবে বাংলা আবার আগের মতো বেশি করে রাজস্ব কেন্দ্রে (দিল্লিতে) পাঠাবে— এমন আশা সম্রাট শাহ আলম ছেড়েই দিয়েছিলেন। এ পরিস্থিতিতে সম্রাট কয়েকবার কোম্পানিকে বাৎসরিক কিছু উপঢৌকনের বদলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দিউয়ানি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলে কোম্পানি তা প্রত্যাখ্যান করে।

এদিকে বক্সার যুদ্ধের পর কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা চরমে উঠলে এবং বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশ খারাপ হলে, ইংরেজ সরকার ভীত হয়ে পড়লেন। ফলে ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ কোম্পানির দুর্নীতি দমন ও স্বার্থ বৃদ্ধির জন্য পুনরায় ক্লাইভকে লর্ড উপাধি দান করে বাংলায় দ্বিতীয়বার প্রেরণ করেন (১৭৬৫-১৭৬৭ খ্রি.)। এদেশে এসেই তিনি মীর কাশিমের মিত্রশক্তি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের প্রতি নজর দেন। বক্সার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০ লক্ষ টাকা এবং কারা ও এলাহাবাদ জেলা দু'টি পেয়ে অযোধ্যার নবাবের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। তারপর তিনি দিল্লির দুর্বল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। ক্লাইভ কারা ও এলাহাবাদ জেলা দু'টি ও বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা কর প্রদানের বিনিময়ে সম্রাটের নিকট হতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিউয়ানি লাভ করলেন (১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ১২ আগস্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিউয়ানি সনদ লাভ করে)।

ফলাফল ও গুরুত্ব

কোম্পানির দিক থেকে বাংলার দিউয়ানি লাভ ছিল এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

প্রথমত: দিউয়ানি লাভ ছিল কোম্পানির জন্য একটি বিরাট রাজনৈতিক বিজয়। এর ফলে সম্রাট ও নবাব একেবারে ক্ষমতাহীন হয়ে ইংরেজদের হাতের পুতুল বনে যায়। নবাবের না ছিল রাজস্ব আদায়ের অধিকার, না ছিল সেনাদল রাখার মতো অর্থবল। নবাবকে নামমাত্র সিংহাসনে বসিয়ে রেখে কোম্পানিই সকল ক্ষমতা অধিকার করে নেয়। ফলে বাংলায় আইনত ও কার্যত ব্রিটিশ শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয়ত: কোম্পানির দিউয়ানি লাভ ছিল কোম্পানির জন্য আরও একটি বিরাট অর্থনৈতিক বিজয়। এর ফলে কোম্পানি নিজের দেউলিয়া অবস্থা হতে রক্ষা পায়। দিউয়ানি লাভের সুযোগ সুবিধা Court of Directors-কে অবহিত করতে গিয়ে লর্ড ক্লাইভ বলেন যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা থেকে যে রাজস্ব পাওয়া যাবে তা এত বেশি যে, সম্রাট ও নবাবের নির্ধারিত ভাতা ও অন্যান্য সামরিক ও বেসামরিক খাতে সমস্ত ব্যায় বাদ দিলেও কোম্পানির হাতে নেট আয় থাকবে ১২ কোটি টাকারও উপর (১৭৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দের রাজস্ব হিসেব থেকে)।

তৃতীয়ত: লর্ড ক্লাইভ Court of Directors-কে আরও জানান যে, ঐ উদ্বৃত্ত রাজস্ব কোম্পানির গোটা বাণিজ্য বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট। ফলে দিউয়ানি লাভের আগে এ দেশে বাণিজ্য করার জন্য ইউরোপ হতে কোম্পানি যে বিপুল পুঁজি নিয়ে আসতো তা দিউয়ানি লাভের পর বন্ধ হয়ে যায় এবং ব্যবসার সমস্ত পুঁজি প্রদেশের রাজস্ব হতেই সংগ্রহ করা হয়।

চতুর্থত: দিউয়ানি লাভের ফলে কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলায় শুল্কহীন অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ পায়। এতে কোম্পানির কর্মচারীদের অর্থের লোভ দিন দিন বাড়তে থাকে। অসুদুপায়ে রাজস্ব আদায় ও আত্মসাৎ করলেও কোম্পানির কর্তারা কোনো পদক্ষেপ নিতেন না। এভাবে অর্থনৈতিক শোষণের ফলে এদেশের মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়।

পঞ্চমত: দিউয়ানি লাভের পর বাংলা থেকে ব্যাপকভাবে অর্থ ও সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার হতে থাকে। তাই ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার দিউয়ানি প্রকৃত অর্থে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনা করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	কোম্পানির দিউয়ানী লাভের উপর একটি নিবন্ধ লিখবেন।

সারাংশ

বক্সারের যুদ্ধের পর বাংলা তথা উপমহাদেশে ইংরেজদের দিউয়ানি লাভ ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপনের ইতিহাসে একটি গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। মীর কাশিমের নবাবী লাভের আগেই ক্লাইভ ইংল্যান্ডে ফিরে যান। কিন্তু ইংল্যান্ড কর্তৃপক্ষ এদেশে কোম্পানির দুর্নীতি দমনের ও বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য আবার তাঁকে লর্ড উপাধিতে ভূষিত করে দ্বিতীয় বার এদেশে প্রেরণ করে। ক্লাইভ বাংলায় এসে দেখেন যে বক্সারের যুদ্ধে ত্রি-পক্ষীয় শক্তিকে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত করার ফলে কোম্পানির একশ্রেণীর কর্মকর্তারা বাংলা ছাড়া অযোধ্যা ও দিল্লিতে আধিপত্য স্থাপনের কথা ভাবছে। ক্লাইভ অত্যন্ত বাস্তববোধ সম্পন্ন বিচক্ষণ লোক ছিলেন। অবশেষে তিনি দিউয়ানি লাভের মাধ্যমে ব্রিটিশ শক্তিকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইংরেজদের এই দিউয়ানি লাভ করাকে বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং এর সূত্র ধরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'হস্তক্ষেপের সনদ' বলা যেতে পারে। ইংরেজরা উপমহাদেশ প্রায় দু'শো বছর শাসন করে। অনেক ঐতিহাসিক তাই, ইংরেজদের এই দিউয়ানি লাভ করাকে ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কত খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি বাংলা বিহার উড়িষ্যার দিউয়ানি লাভ করে?
ক) ১৭৬৪ খ) ১৭৬৫ গ) ১৭৬৬ ঘ) ১৭৬৭

২। বাৎসরিক কত টাকার বিনিময়ে কোম্পানী দিউয়ানি লাভ করে?
ক) ২৪ লক্ষ খ) ২৫ লক্ষ গ) ২৬ লক্ষ ঘ) ২৭ লক্ষ

৩। কোন নবাবের সময় থেকে দিল্লিতে রাজস্ব পাঠানো প্রায় বন্ধ হয়ে যায়?
ক) আলীবদ্দী খাঁ খ) সিরাজদ্দৌলা গ) মীর জাফর ঘ) মীর কাশিম

৪। মোগল শাসনতান্ত্রিক প্রথা ভঙ্গ করে কে প্রথম দিউয়ানির পদটিও নিজে দখল করেন?
ক) আলীবর্দ্দী খাঁ খ) সিরাজউদ্দৌলা গ) মীর জাফর ঘ) মুর্শিদকুলী খাঁন

৫। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দিউয়ানি লাভের ফলে–
i. বাংলায় আইনত ও কার্যত ব্রিটিশ শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়
ii. ব্যবসার সমস্ত পুঁজি প্রদেশের রাজস্ব থেকেই সংগ্রহ করা হয়
iii. ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

মামুন একজন প্রাদেশিক সুবাদার। মোগল শাসনতন্ত্রে প্রদেশ প্রশাসনে দুটি সমপর্যায়ের পদ ছিল। একটি সুবাদার অন্যটি দিউয়ান। সুবাদার ও দিউয়ান উভয়ই সরাসরি সম্রাটের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকতেন। তারা একে অন্যকে সাহায্য করতে পারতেন; কিন্তু একে অন্যকে তার অধীন করতে পারতেন না। সুবাদারের দায়িত্ব ছিল বিচার প্রতিরক্ষা ও সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা, অন্যদিকে দিউয়ানের দায়িত্ব ছিল রাজস্ব প্রশাসন। দিউয়ানের অর্থই হলো– রাজত্ব আদায়ের কর্তৃত্ব লাভ করা। কোনো প্রাদেশিক শাসনকর্তা যেন সেচ্ছাচারী ও স্বাধীন হতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই ক্ষমতা বিভাজনের এই ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু মামুনই প্রথম সুবাদার যিনি মোগল শাসনতান্ত্রিক এই প্রথা ভঙ্গ করে দিউয়ানের পদটিও নিজে দখল করেন।

ক. ক্লাইভকে কখন লর্ড উপাধী প্রদান করা হয়? ১
খ. "হয় খ্রিস্টাধর্ম গ্রহণ কর অথবা মৃত্যুবরণ কর"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের মামুনের সাথে পাঠ্য পুস্তকের যে সুবাদারের সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তার শাসন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. "ইংরেজদের দিউয়ানি লাভ ইতিহাসের যুগান্তকারী ঘটনা"– বিশ্লেষন করুন। ৪

পাঠ-৫.৬ দ্বৈতশাসন ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দ্বৈত শাসন বলতে কী বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- দ্বৈত শাসনের ফলাফল সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	দ্বৈত শাসন, ছিয়াত্তরে মন্বন্তর, নাযিম, দিউয়ান

পূর্ববর্তী পাঠে আপনারা জেনেছেন ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা এলাহাবাদ চুক্তি বলে দিউয়ানি লাভ করে। এ সময় লর্ড ক্লাইভ বাংলার গভর্নর হয়ে আসেন এবং এদেশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এক নতুন দ্বৈত শাসন নীতি প্রর্বতন করেন। দিউয়ানি এবং নিযামত-এই দ্বিবিধ শাসন কার্যের দায়-দায়িত্বের ভাগাভাগিকে দ্বৈত শাসন বলে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় ও দেশ রক্ষার ভার থাকে কোম্পানির হাতে; আর নিযামত বা বিচার ও প্রশাসন বিভাগের দায়িত্ব থাকে নবাবের উপর। কোম্পানির সরাসরি দিউয়ানির দায়িত্ব গ্রহণে বেশকিছু অসুবিধা ছিল। সরাসরি দিউয়ানি শাসনের জন্য কোম্পানির যে অর্থ ও লোক বল প্রয়োজন তা তাদের ছিল না। উপরন্তু এদেশীয় ভাষা, আইন কানুন সম্পর্কে কোম্পানির কর্মচারীদের জ্ঞান না থাকায় রাজস্ব শাসন সরাসরি গ্রহণ করা ছিল কোম্পানির জন্য বিপদজনক। তা ছাড়া কোম্পানি সরাসরি রাজস্ব গ্রহণ করলে বাংলায় বাণিজ্যরত অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের সাথে সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য। কেননা, বাণিজ্যিক শুল্ক আদায় ছিল দিউয়ানির অন্তর্গত। অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো দেশীয় সরকারকে শুল্ক দিতে রাজী থাকলেও ইংরেজদের শুল্ক দিতে রাজী ছিল না। অতএব ক্লাইভ বুদ্ধি করে দিউয়ানির সমস্ত শাসনভার দেন নবাবের উপর এবং কোম্পানির কাছে রাখেন শুধু কেন্দ্রীয়ভাবে তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা। কোম্পানি ইচ্ছামত রাজস্ব সংগ্রহ করে সম্রাট ও নবাবের ভাতা এবং শাসনকার্যের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা রেখে উদ্বৃত্ত অর্থ নিজেরা গ্রহণ করতো। এ ব্যবস্থার ফলে দায়দায়িত্ব ছাড়াই প্রকৃত ক্ষমতা থাকে কোম্পানির হাতে। তাই অন্যভাবে, অতি সহজেই বলা যেতে পারে যে, নবাব পেলেন ক্ষমতাহীন-দায়-দায়িত্ব আর কোম্পানি লাভ করলো দায়িত্বহীন ক্ষমতা।

এতকাল ধরে বাংলার নবাবগণ ছিলেন একাধারে নাযিম ও দিউয়ান। নাযিম হিসেবে তাঁরা শাসন, বিচার ও প্রতিরক্ষার কাজ চালাতেন। আর দিউয়ান হিসেবে তাঁরা রাজস্ব সংগ্রহ করে ব্যয় করতেন। কিন্তু দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় নবাবের ক্ষমতা কমিয়ে তাঁর উপর অনেক দায়িত্ব দেয়া হয়; অথচ অর্থ ও ক্ষমতা ছাড়া দায়িত্ব অর্থহীন। অধিকন্তু, রাজস্ব বিভাগের সঙ্গে ফৌজদারী ও দিউয়ানি বিচার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এতে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে প্রকৃত কর্তৃত্ব কোম্পানির হাতেই থেকে যায়। নবাব অনেক দায়িত্ব বহন করে শুধু বৃত্তিভোগী হিসেবে রয়ে গেলেন।

নবাব নাবালক হওয়ার অজুহাতে ক্লাইভ তাঁর অভিভাবক হিসেবে রাজস্ব বিশারদ সৈয়দ মুহম্মদ রেজা খানকে নিযুক্ত করে নায়েব নাজিম উপাধি দান করেন এবং তাঁর উপর বাংলার রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দেন। অন্যদিকে বিহারের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেয়া হয় রাজা সেতাব রায়কে। তাঁরা ছিলেন কোম্পানির প্রতিনিধি দিউয়ান। তাঁদের উপাধি দেয়া হয় নায়েব দিউয়ান। কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার্থে তাঁরা রাজস্ব আদায় করতেন এবং কোম্পানির আদেশ মেনে চলতেন। অন্যদিকে কোম্পানির পক্ষ থেকে তাঁদের উপর নজর রাখার জন্য মুর্শিদাবাদ দরবারে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি অবস্থান করতেন। ফলে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় জটিলতার সৃষ্টি হয়। কারণ আদায়কৃত রাজস্ব থেকে শাসনকার্যের সকল ব্যায় মেটানোর পর উদ্বৃত্ত অর্থ রেজা খানকে কোম্পানির হাতে তুলে দিতে হতো; অথচ রাজস্ব বৃদ্ধির হার বাড়ানো বা কমানোর

ক্ষমতা থেকে যেতো কোম্পানির হাতে। ফলে রেজা খানকে এমনি এক উদ্ভূত অবস্থা মোকাবেলা করতে হয় এবং জনসাধারণও এক অমানুষিক দুঃখ-দুর্দশার শিকারে পরিণত হয়। এরই ফলে ১১৭৬ বঙ্গাব্দে (১৭৭০ খ্রি.) বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত।

ফলাফল

লর্ড ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থায় সুফলের পরিবর্তে কুফলই দেখা যায় বেশি। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার কুফল বাংলার শান্তি, স্থিতি ও সমৃদ্ধিকে ধ্বংস করে দেয় এবং বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থায় এক চরম দুর্যোগ শুরু হয়।

প্রথমত: এ ব্যবস্থায় নবাবের দেশ শাসনের দায়িত্ব ছিল বটে; কিন্তু তাঁর কোনো ক্ষমতা ছিল না। অন্যদিকে, কোম্পানির ক্ষমতা ছিল বটে; কিন্তু কোনো দায়িত্ব ছিল না। কর্তৃত্বের এরূপ বিভাগ বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে না। ফলে দেশে আইন শৃঙ্খলায় অবহেলার দরুন ডাকাতরা গ্রাম-বাংলায় লুঠ-পাট চালাতে থাকে। নবাব ও কোম্পানি কোনো পক্ষই এদের শায়েস্তা করার চেষ্টা করেন নি। ফলে গ্রাম-বাংলা জনশূন্য হতে থাকে।

দ্বিতীয়ত: দ্বৈত-শাসনের ফলে বাণিজ্য কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে অবনতি ঘটে। বাংলার স্বাধীন নবাবী আমলে বহু বিদেশি ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি এদেশের পণ্য কিনে নিয়ে যেত। কিন্তু কোম্পানির নতুন বাণিজ্য নীতির ফলে এদেশের ব্যবসা ক্ষেত্রে ইংরেজদের একচেটিয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে দেশীয় ও অন্যান্য বিদেশি ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যে মার খান এবং দেশের রপ্তানি আয় সর্ব নিম্ন পর্যায়ে নেমে যায়। কেননা ব্রিটিশ সরকার ইংলন্ডে কমদামী মুর্শিদাবাদী রেশম আমদানি বন্ধ করে দেয় ইংল্যান্ডের বেশি দামী রেশম শিল্পকে বাঁচাতে। ফলে এদেশীয় কারিগররা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

তৃতীয়ত: দ্বৈত শাসন-প্রবর্তনের ফলে, বাংলায় 'আমিলদারী'-প্রথার উদ্ভব হয়। রেজা খান বিভিন্ন জেলার আমিলদের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তাঁদের হাতে ছেড়ে দিতেন। যেহেতু আমিলদের চাকুরীর মেয়াদ ছিল স্বল্প মেয়াদী সেহেতু তাঁরা যেভাবেই হউক রাজস্ব বেশি করে আদায় করতো। কারণ জেলার যে জমিদার যত বেশি রাজস্ব দিতে পারতো আমিলরা তাঁদেরকেই রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিত। এতে করে জমিদাররা ইজারাদারে পরিণত হয়। ফলে বাংলার জনজীবন আমিলদারী ব্যবস্থায় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

চতুর্থত: কোম্পানির কর্মচারী গোমস্তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা ও অত্যাচারের ফলে দেশের সম্পদ কমতে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে ইংল্যান্ডে পাচার হতে থাকে; অথচ রাজস্বের হার প্রতিবছর বাড়তে থাকে। দেখা যায় যে পূর্ণিয়া জেলার বাৎসরিক রাজস্ব যেখানে মাত্র চার লক্ষ টাকা ছিল, সেখানে তা বেড়ে গিয়ে পঁচিশ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়। এমনিভাবে দিনাজপুর জেলার রাজস্ব বার লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে গিয়ে সত্তর লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়। সম্পদের অতিরিক্ত এই রাজস্ব সংগ্রহ করতে রেজা খানের উপর চাপ আসে। ফলে রাজস্ব সংগ্রহ করতে রেজা খানকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। ফলে অনেক পরগনা হতে রায়তরা আমিলদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অন্য জায়গায় পালিয়ে যায় বা পেশা পরিবর্তন করে।

পঞ্চমত: দিউয়ানি ও দ্বৈত শাসনের চূড়ান্ত পরিণাম ছিল বাংলায় 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' ধ্বংসলীলা (১৭৭০ খ্রি. ১১৭৬ বঙ্গাব্দ)। একদিকে দ্বৈত শাসনের দায়িত্বহীনতার ফলে বাংলার জনজীবনে অরাজকতা নেমে আসে, অন্যদিকে অবাধ লুণ্ঠন ও যথেচ্ছভাবে রাজস্ব আদায়ের ফলে গ্রাম্যজীবন ধ্বংস হয়ে যায়। তদুপরি পরপর দু'বছর অনাবৃষ্টি ও খরার ফলে ১১৭৬ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় এক প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। টাকায় একমণ হতে চাউলের মূল্য বাড়তে বাড়তে টাকায় তিন সেরে এসে দাঁড়ালো। খোলাবাজারের খাদ্যশস্য বেশি লাভের আশায় কোম্পানির কর্মচারীরা মজুদ করা শুরু করে। ফলে খাদ্যের অভাবে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দলে দলে লোক খাদ্যের আশায় কলকাতা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের দিকে ছুটে আসে। এই সময়েও খাজনা মওকুফ করা হয় নি।

ইংল্যান্ডের কৃষ্ণ মড়কের মতো ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ছিল ভয়ঙ্কর সর্বনাশা। ফলে গ্রাম-বাংলা জনশূন্য হয়। এই দুর্ভিক্ষে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ জেলাগুলো ছিল নদীয়া, রাজশাহী, বীরভূম, বর্ধমান, যশোহর, মালদহ, পূর্ণিয়া ও চব্বিশ পরগণা। বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে বিশেষ ফসলহানি না হওয়ায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ তেমন একটা ছিল না। তাছাড়া 'নাজাই' প্রথার প্রকোপ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য কৃষকেরা ভিটে মাটি ছেড়ে পালায়। 'নাজাই' প্রথার অর্থ ছিল, কোনো একজন রাজস্ব বাকী ফেললে সেই গ্রামের অন্য কৃষকদের সেই রাজস্ব দিতে হতো। মন্বন্তরের ফলে বহু কৃষক মারা পড়ায় তাদের বকেয়া রাজস্বের দায়িত্ব জীবিত কৃষকদের উপর বর্তায়। এই দায়িত্ব বইতে না পেরে বহু কৃষক জমির স্বত্ব ছেড়ে পাইকে পরিণত হয়। সামগ্রিকভাবে কৃষির অবনতি ও অনাবৃষ্টির ফলে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ১১৭৬ বঙ্গাব্দে দেশে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তা ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। এ দুর্ভিক্ষের চিহ্ন বাংলায় প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

দুর্ভিক্ষের এক পরোক্ষ ফল দিউয়ানি শাসনের অবসান ঘটে। কোম্পানির রাজস্বের আয়-কমে যায়। বাণিজ্যেরও মন্দা দেখা দেয়। তাই কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার জন্য ও বাংলার কৃষি শিল্পকে রক্ষার জন্য বিলাতের পরিচালক সভা দ্বৈত শাসন লোপ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ওয়ারেন হেস্টিংসকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, এখন থেকে কোম্পানি যেন বাংলার রাজস্ব ও শাসনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ক্লাইভের এই দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় একটি ভাল দিক ছিল এই যে, এটা মোগল শাসন ব্যবস্থাকে অটটু রাখে। প্রথমে কোম্পানির কর্মচারীরা রাজস্ব ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করে নি। অন্তত ক্লাইভ যতদিন কোলকাতা ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর ছিলেন ততদিন রেজা খান কৃতিত্বের সাথে মুগলী প্রথায় শাসনকার্য পরিচালনা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে ক্লাইভ স্বদেশে ফিরে গেলে তাঁর দ্বৈত ব্যবস্থায় ফাটল ধরে।

শিক্ষার্থীর কাজ	কোম্পানির দ্বৈত শাসনের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করবেন।

সারাংশ

পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ের পর ইংরেজ বেনিয়ারা এদেশে আধিপত্য বিস্তারের যে প্রয়াস শুরু করেছিল, তাদের দিউয়ানি ও দ্বৈত-শাসন লাভের মধ্য দিয়ে তা পূর্ণতা লাভ করে। লর্ড ক্লাইভ এদেশে এক অভিনব শাসন ব্যবস্থা চালু করেন যার মূল উদ্দেশ্যই ছিল কোম্পানিকে শক্তিশালী করে সম্রাট ও নবাবকে ক্ষমতাহীন করে তোলা। এতে দিউয়ানি ও দেশরক্ষার ব্যবস্থা থাকে কোম্পানির হাতে এবং বিচার ও শাসনভার থাকে নবাবের হাতে। এরই নাম দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় কোম্পানি পেলো দায়িত্বহীন ক্ষমতা আর নবাব পেলো ক্ষমতাহীন দায়িত্ব।

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা এদেশের জন্য কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বয়ে এনেছে বেশি। ক্ষমতা পেয়েই কোম্পানির কর্মচারীরা দেশের মানুষের উপর রাজস্বের জন্য নানাভাবে অত্যাচার ও উৎপীড়ন করতে থাকে। কিন্তু নবাবের হাতে কোনো ক্ষমতা না থাকায় এর বিচার সম্ভব হয় নি। ফলে দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পের দারুন ক্ষতি হয়। সামগ্রিকভাবে কৃষির অবনতি, উপরন্তু অনাবৃষ্টির ফলে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা ১১৭৬ সনে) দেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যা ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। অবশেষে এর কুফলের প্রেক্ষিতে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। কত খ্রিস্টাব্দে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু হয়?
ক) ১৭৫৭ খ) ১৭৬৫ গ) ১৭৬৭ ঘ) ১৭৭০

২। বাংলার রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয় কাকে?
ক) রেজা খাঁন খ) সেতাব রায় গ) নজমুদ্দৌলা ঘ) রামনারায়ণ

৩। কত খ্রিস্টাব্দে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়?
ক) ১৭৭০ খ) ১৭৭১ গ) ১৭৭২ ঘ) ১৭৭৩

৪। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলায় কত লোক মারা যায়?
ক) এক ষষ্ঠাংশ খ) এক পঞ্চমাংশ গ) এক চতুর্থাংশ ঘ) এক তৃতীয়াংশ

৫। কত খ্রিস্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ স্বদেশে ফিরে যান।
ক) ১৭৭৫ খ) ১৭৭৬ গ) ১৭৭৭ ঘ) ১৭৭৮

সৃজনশীল প্রশ্ন

জুলির নানা ব্রিটিশদের রাজকর্মচারী ছিলেন। মায়ের কাছে জুলি ব্রিটিশ শাসনের গল্প শুনছিল। মা বললেন– তখন বাংলা ১১৭৬ সাল। লর্ড ক্লাইভের দ্বৈত শাসনে মানুষ জর্জরিত। কোম্পানির হাতে দায়িত্বহীন ক্ষমতা। রাজস্বের পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে দেয়া হলো। উপরিউক্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পরপর দুই বছর মাঠে কোনো ফসল ফলে নি। না খেয়ে মারা যায় বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ। যারা বেঁচে ছিলেন তাদেরকে পরিশোধ করতে হলো মৃত মানুষের খাজনা। ফলে উজাড় হয়ে যায় গ্রাম-বাংলার জনপদ। মায়ের চোখ-ঝাপসা হয়ে আসে। জুলি মাকে থামিয়ে দেয়।

ক. কত খ্রিস্টাব্দে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়? ১

খ. নাজাই প্রথা কী? ২

গ. উদ্দীপকের জুলির মায়ের গল্পের সাথে পাঠ্য পুস্তকের সে দুর্ভিক্ষের সাদৃশ্য আছে তা বর্ণনা করুন। ৩

ঘ. "দ্বৈত শাসন বাংলার অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল"– বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১ ঃ ১। ক ২। গ ৩। ক ৪। গ ৫। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২ ঃ ১। খ ২। ক ৩। খ ৪। গ ৫। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। গ ৫। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪ ঃ ১। ক ২। গ ৩। খ ৪। ক ৫। ক ৬। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। ঘ ৫। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৬ ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। খ